"গীতারত্ন" শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ প্রবর্ত্তিত ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী বাংলা মাসিক পত্রিকা (৬৭তম বর্ষ)

পার্থসারথি

(মুদ্রণ : জুন, ১৯৬০ থেকে মার্চ, ২০২০ / আন্তর্জাল : এপ্রিল, ২০২০ থেকে)

৭৮ তম অন্তর্জাল সংখ্যা

৬ই আশ্বিন, ১৪৩৩ / *24.09.2026*

- সম্পাদক -

সুনন্দন ঘোষ

Website: https://www.parthasarathipatrika.com

- সূচিপত্র -

(৭৮ তম অন্তর্জাল সংখ্যা)

প্রীতি-কণা	শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ
আত্ম-কথা	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
জন্মাষ্টমী	স্বামী সর্বানন্দ সরস্বতী
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রণাম অস্ত্র	শ্রী সৌমিত্র মজুমদার
রোমুলাসের রোম	শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য
শরৎ (কবিতা)	শ্রী স্বপন মহান্তী
জন্মাষ্টমী	শ্রী শান্তশীল দাশ
কমলা রোদ্দুরে	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

Founded by Sri Priti Kumar Ghosh in June, 1960, PARTHASARATHI Bengali Monthly Magazine, RNI 5158/ 60, published in print format for sixty years, thereafter converted to e-magazine by Sri Sunandan Ghosh, Editor & Publisher in April, 2020 during prolonged Nationwide Lockdown and to be published in the Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D/1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 8910977590.

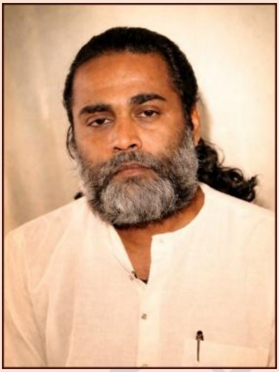

[১০.০৩.১৯২৬ – ২৪.১১.১৯৮৬]

প্রীতি-কণা

"সংসারে সকলেরই সন্তান থাকে না। যখন আমার আছে এবং ঈশ্বর যখন বিশ্বাস করিয়া তাহাদের আমার নিকট পাঠাইয়াছেন, তখন তাঁহাদের ঈশ্বর জ্ঞানে সেবা করিতে হইবে। তুমি যত বেশী তোমার স্ত্রী পুত্রদের আনন্দে রাখিতে পারিবে, তত বেশী ঈশ্বর খুশি হইবেন, কারণ তাহাদের ভিতর দিয়া সংসারের যে রস ও মাধুর্য্য তাহা আস্বাদন করিতেছেন। যেমন, তুমি বাজার করিতেছ, কাহার জন্য করিতেছ? ঈশ্বরের জন্য করিতেছ। রান্না করিতেছ, তাহাও ঈশ্বরের জন্য করিতেছ। তুমি বিছানা যখন করিবে, মনে রাখিবে সে বিছানায় তোমার সঙ্গে তোমার ঈশ্বরও বিশ্রাম করিবেন। সর্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সৌন্দর্য্য ভাব লইয়া থাকিতে হয়, কারণ ঈশ্বর সর্বদাই আমাদের সঙ্গেই আছেন। বাজার বলো রান্না বলো কোন জিনিষই তুমি খারাপ ভাবে করিতে পারিবে না কারণ তোমার ছেলে মেয়ে গ্রহণ করিবে। যেমন ভগবানের জন্য পূজার উপকরণ আমরা শুদ্ধ ও পবিত্র রাখি, তেমনই এ সংসার ও স্ত্রী পুত্র যাহা কিছু আমরা সংসার বলিতে বুঝি, সবই ঈশ্বরময়। সর্বদা মনে রাখিবে, তোমার স্ত্রী পুত্র যদি সংসারে আনন্দে ও সুখে থাকে তবে ঈশ্বরও সুখ ও আনন্দ লাভ করেন। ঈশ্বর লীলাময়, তিনি জগৎ সংসারে লীলা করিতেছেন, আর আমরা তাঁর এই লীলার সহায়তা করিবার জন্য আসিয়াছি । তাই সর্বদা নিজেকে খুলিয়া রাখিতে হয় ঈশ্বরের দিকে, যাতে তিনিও আমাদের তাঁর কাজের মত করিয়া গড়িয়া নিতে পারেন।"

আশা করছি পার্থসারথি পত্রিকা এবার ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তির আগে বেরোবে! ১০ই মার্চ শ্রীপ্রীতিকুমারের জন্মদিন। সেদিন ছাপাখানাধিরাজদের কৃপা হবে আশা করছি। আগে সম্পাদক মশাই নিয়মিত তাগাদা দেবার জন্য ও পাড়াতে যেতেন। এখন তারও সময় কম। তাঁর অতিরিক্ত কর্মোৎসাহের জন্য ইদানীং রাত ৯টা/ ১০টায় বাড়ী ফিরতে হচ্ছে। বাড়ী ফিরেও নিস্তার নেই। রাত ১০টাতেও ফোন আসে। ভোর পাঁচটাতেও ফোন আসে। এইভাবে যদি টেলিফোন আসে আমি স্থির করেছি সামনের বার থেকে শ্রীযুক্ত বাবু সুনন্দন ঘোষ মশাই টেলিফোনের Bill Pay করবেন। তিনি বলবেন ফোন রিসিভ করতে তো পয়সা লাগে না। আমি বলব রিসিভ করতে সময় চাই। কাজ ফেলে ফোন ধরতে হয়। তাছাড়া বাড়ীটা যেন WBSEB-র Hd. Qr. হয়ে গেছে। দিবারাত্র লোকজন। "ঘোষ সাহেব" কোথায় ? কখন আসবেন? বাজারে না শ্বশুরবাড়ী? অফিসে না নিক্কো পার্কে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এডভোকেটদের মত গুচ্ছ গুচ্ছ কাগজ নিয়ে বাড়ী ঢুকছে। রাত ১২টা - ১টা পর্যন্ত একটা ক্যালকুলেটর নিয়ে ঢুলছে। আমার জানতে ইচ্ছে করে WBSEB-র একজন Asst. Engr.-এর যদি এই দশা হয় তাহলে D.E, S.E, C.E.-দের কি অবস্থা? তাঁদের বাড়ীর লোকেদেরই বা কি দশা? আগে জানলে কি আর WBSEB-তে চাকরী করতে পাঠাতাম? P.W.D-তে join করতে বলতাম। শ্রীপ্রীতিকুমার রসিকতা করে বলতেন যারা PWD-তে চাকরী করে, তারা নিয়মিত কোট পরে অফিসে যান। আমার পুত্তর জীবনেও কোট পরে না। মা একখানা মোটর সাইকেল কিনে দিয়েছিল। সেটা কয়েকদিন আগে এক্সিডেন্ট-এ piece piece হয়ে গেছে। প্রাণটা যে আস্ত আছে এটাই ঈশ্বরের দয়া। বউটার অসুবিধা হয়ে গেছে মোটর সাইকেল না থাকাতে। নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে না যদি বর এসে যায়। আগে 'ঘোষ সাহেব' মোটর সাইকেলে চিড়িয়ামোড়ে পৌঁছালেই বধূমাতা দরজা খুলে রাখতেন এমন ছিল সেই গাড়ীর আওয়াজ। মেয়েও ছটফট করে উঠতো। এখন আমরা দরজায় কড়া

নাড়ার জন্য অপেক্ষা করি। কিশোর এখন মামীমার কাছে appeal রেখেছে পুত্তরকে আরেকটি মোটর সাইকেল কিনে দেবার জন্য। আমার অন্ততঃ ঐ মোটর সাইকেলে আর আস্থা নেই। আমি বাচেন্দ্রীকে ঐ গাড়ী চড়তে allow করব না। ফলে বিরোধ বাড়বে। আজকালকার ছেলেমেয়েদের তো মনের মত কাজ না হলেই অশান্তি। আবার একমাত্র সন্তান হলে তো কথাই নেই। আমি কোনও অশান্তির কারণ হতে চাই না।

স্বামী বিবিদিষানন্দজী একদিন আমাদের বাড়ী পদধূলি দিয়ে গেলেন। আমাদের বাড়ীতে তাঁর আসবার আর সময়ই হয় না। দুটি পায়ে যেন চাকা লাগানো আছে। আজ যদি কলকাতায় থাকেন তো কাল দিল্লী, পরশু লাতুর, তারপর দিন বেনারস। যখনই ফোন করি, তিনি নেই। হয় কাল কলকাতা ছেড়ে চলে গেছেন, নয়ত কাল কলকাতায় আসবেন। এবার তাঁকে ধরে ফেলেছি। এঁদের কৃপা আছে বলেই আমি এত সাহস পাই। জীবনটাকে তো যেমন তেমন ভাবে টেনে নেওয়া যায় না। একটু গুছিয়ে নিতে হয়। সারা জীবন বটবৃক্ষের ছায়ায় বাস করে গত সাত বছর কি ভাবে দিন কেটেছে তা আমার ও বাপীর থেকে কে বেশী জানে? অনেকেই দেখেছেন চোখে। কিন্তু মানসিক কষ্টটা? মানসিক কষ্ট দূর করতে ঈশ্বরের কৃপাই প্রয়োজন। ঈশ্বরকে আমরা প্রত্যক্ষ করি এই সব সাত্ত্বিক ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে। আমার ধারণা বাকী জীবনটাও আমার এই ধর্মীয় অনুভূতি থাকবে।

আমার আর তিন বছর চাকরী আছে। তিন বছরের মধ্যে আমি গত হব না আশা করি। তিন বছর পর আমার আর বাইরে বেরোতে হবে না, সেই আনন্দেই আছি। আমাকে তিনটি বাস বদল করে কলেজে যেতে হয়। এখনই বাসের পাদানিগুলি বড় উচু মনে হয়। মনে হয় নীচে যদি কেউ একটা টুল ধরতো বড় ভালো হোত। এই বয়সে ও শরীরে দিনে কম করে ছ'বার গাড়ী বদলানো যে কি কষ্টকর তা একমাত্র আমার মতো বয়সী ও আমার মতো ওজনের মানুষই বুঝতে পারবে, অন্যেরা তো ঠাট্টা করবে। এখন তো বাসে ট্রামে আমি কোথাও যাই না।

কিশোরের বাড়ী টালিগঞ্জে। শ্রীলার বাড়ী বালীগঞ্জে। ফেরবার সময় ওরা আমাকে ট্যাক্সিতেই পাঠিয়ে দেন। যাতায়াতটা আমার আজকাল কমেই গেছে।

এবার কিশোরের কথায় আসি। অনেক দিন ধরে তাকে বিশ্রাম নিতে বলছিলাম, শোনেনি। তীরের বেগে ছুটছিলো। সমানে খেটে যাচ্ছিলো। হয়ত ভাবছিলো শরীর যখন খারাপ তখন ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতে হবে। আসলে "শরীরের নাম মহাশয় যা সওয়াবে তাই সয়।" সেই শরীরে ভাঙ্গন ধরেছে।

মলির মানসিক পরিবর্তন হতে পারে, আচার আচরণে পরিবর্তন আসেনি। তাকে কেউ সারাদিন ভূতের মতো কাজ করতে বলেনি। তাকে কেউ রাত ১২টায় শুতে বলেনি। সমস্ত বউরা যখন সন্ধ্যার আগে চুল বেঁধে নেয়, মলি তখন চুল ভিজিয়ে স্নান করে। অবশ্য যেটা বদলাবেই না, সেটা নিয়ে আলোচনা করবার আমার দরকার কি! কিছুই নয়। কিশোর আমার পুত্রতুল্য। আামি শ্রীপ্রীতিকুমারের কাছে তার দীর্ঘায়ু কামনা করি।

এবার আসি ছেলেমেয়ের শাসনের কথায়। আমাকে মোটামুটি ছোটরা বেশ ভয় পায়। বড়রাও। বাচেন্দ্রী তো এক একটি অপকর্ম করে আমার কাছ থেকে উধাও হয়ে যায়। তাকে বকলে মাঝে মাঝে Straight চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমি এখনও অপেক্ষা করে আছি ওর কথা বলা শেখবার জন্য। তারপর শাসন শুরু করব। আগে বলে লাভ নেই।

এবার কিশোরের মেয়ে কস্তুরীর কথা বলতে হয়। সে সকালে ঘুম থেকে ওঠে আটটা নটায়। দুপুরে স্কুলে থাকে। স্কুল থেকে আসবার পর তার মা মেয়েকে ঘুমোতে দেয় না মোটা হয়ে যাবে। কিন্তু সে রাত্রে ডিনার-এর পর নিয়মিত এক প্লেট আলুভাজা খায়। তার অভ্যাস। সন্ধ্যায় সে মেট্রো চ্যানেল দেখবার জন্য ক্ষেপে যায়। রবিবারে তিনটে সিনেমা হোলে সে তিনটে সিনেমাই দেখে টিভি-তে। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে। রাশিকৃত হোম টাস্ক নিয়ে আসে। রাত্রে বেশীটা কিশোরের সাহায্যে সে টাস্ক হয়ে যায়। কিশোর রাত ১টায় শুতে গেলে মেয়েও রাত একটায়

শোয়। এবং প্রতিদিন বাবার কাছে তার গল্প শোনা চাই। রাত্রে বাবা বাড়ী ফিরলে তক্ষুনি দোকানে গিয়ে তাকে কিছু কিনে এনে দিতে হবে।

পূর্বেকার পণ্ডিতেরা অনেক হিসেব করেই শ্লোক লিখে গেছেন-

লালয়েত পঞ্চবর্ষানি, দশবর্ষানি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শবর্ষে, পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ ।।

কথাটা যে কতদূর সত্য আমার চেয়ে বেশী কেউ জানে না। আমি ষোড়শবর্ষের আগেই পুত্রের সঙ্গে মিত্রবৎ আচরণ করে হালে পানি পাচ্ছি না। আর অতিরিক্ত বই পড়ানোর অভ্যাস করেছিলাম তাই যে কোনও ব্যাপারে সে যে কোন শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত করে। আমার একেবারেই তখন মনে হয় না যে আমি কোনও দিন লেখাপড়া করেছি। সব ভুল হয়ে যায়।

মাঝে বাচেন্দ্রীর শরীরটা Triple Antigen নিয়ে খারাপ গেল। আজ আর লেখার সময় নেই। এরপর থাকবে শ্রীপ্রীতি-কুমারের জন্মদিন ১০ই মার্চের বর্ণনা।

(** রচনাকাল – মার্চ, ১৯৯৪)

জন্মাষ্টমী

স্বামী সর্বানন্দ সরস্বতী

জন্মাষ্টমী তিথি ভারতের হিন্দু জাতির বিশেষ স্মরণীয় তিথি। পুরাণে বর্ণিত দ্বাপরের শেষ অধ্যায়ে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে মথুরায় কংস-কারাগারে বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে স্বয়ং ভগবান পূর্ণ অবতাররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন মদমত্ত স্বেচ্ছাচারী সাধুসন্তনিপীড়নকারী দুষ্ট কংসকে নিধন করিয়া এবং ঐরূপ রাজন্যবর্গের বিলোপ করিয়া, সমাজের ভারাপহরণ করতঃ ধর্মরাজ্য স্থাপন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। গীতায় স্বয়ং ভগবান নিজমুখে বলিয়াছেন, "যদা যদাহি

ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।”

মায়াবিমোহিত জীবকল্যাণার্থে জীবোদ্ধারকল্পে, ভগবানের এই আশ্বাসবাণী বা অভয়বাণী প্রতিপালনের জন্য তিনি যুগে যুগে ধরাধামে যুগোপযোগী রূপধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, হইতেছেন এবং হইবেনও, ইহাতে কোন সংশয় নাই। কারণ আমরা ব্যবহারিক জগতে দেখিতে পাই, যখনই কোন অন্যায় অত্যাচারী প্রবল হইতে প্রবলতর, প্রবলতমে পৌঁছিয়াছে, তখনই তাহার প্রতিকারের জন্য এক দুর্বারশক্তির সৃষ্টি হইয়া তাহাকে ধ্বংস করতঃ শান্তিস্থাপন করিয়াছে। অন্যায় বা পাপের একটা সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করিয়া কেহ আর অগ্রসর হইতে পারে না। সেইখানেই তাহার গতিরোধ হইয়া যায়, তাহাকে ফিরিতে হয়। কিন্তু পুণ্যের সীমা নাই, তাহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে ধরায় অবতরণ করেন। ভাগবত রচয়িতা ব্যাসদেব বলিয়াছেন—“কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।” শ্রীকৃষ্ণের জীবনী পর্যালোচনা করিলে তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। ভগবান শব্দের অর্থ ভগ আছে যাহার সে ভগবান। ভগ কাহাকে বলে? ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তিকে ভগবান বলা হয়। ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণং ভগ ইতীঙ্গনা॥ যাঁহার মধ্যে সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্য বিদ্যমান থাকে, তাঁহাকে ভগবান বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলি পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল বলিয়া তাঁহাকে পূর্ণ অবতার বা ভগবান বলা হইয়া থাকে।

১। সমগ্র ঐশ্বর্য্য- দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র ঐশ্বর্য্যসমন্বিত ছিলেন। তাঁহার বৈভবের দ্বিতীয় উপমা নাই।

২। সমগ্র বীর্য্য— শ্রীকৃষ্ণের মত বীর্য্যশালী পুরুষ পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। জন্মকাল হইতে তাঁহার অলৌকিক শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। শৈশবে পুতনাবধ, বকাসুর, প্রলম্বাসুর, তৃণাবর্ত প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ অসুরগণের বধ, কনিষ্ঠাঙ্গুলির দ্বারা সপ্তাহব্যাপী গিরি গোবর্দ্ধনধারণ, কালীয়দমন, প্রচণ্ড দাবানলপান প্রভৃতি কীর্ত্তিসমূহ তাঁহার সমগ্র বীর্য্যবত্তার পরিচয় প্রদান করে। কৈশোরে সমস্ত ব্রজবালাগণের মনোহরণপূর্বক তাঁহাদের সহিত বিহার ও রাসলীলা, পরম পুরুষত্ব ব্যতীত হীনবীর্য্যের পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নহে। পৌগণ্ড অবস্থায় মহাবলবান মদমত্ত কুবলয় হস্তীপীড়ন, দুর্দ্ধর্ষ মল্লযোদ্ধা চাণুর ও মুষ্টিকের বধ, মহাপরাক্রমশালী রাজা কংসের বধ; যৌবনে সহস্র সহস্র রাজন্যবর্গকে পরাজিত করিয়া স্বয়ংম্বরসভা হইতে রুক্মিণী, সত্যভামা, কালিন্দী, নগ্নজিতি, জাম্ববতী প্রভৃতি সাতজন রাজকন্যাকে হরণপূর্বক তাঁহাদের পাণিগ্রহণ এবং নরকাসুরকে বধ করিয়া তাহার কারাগার হইতে ষোল সহস্র যুবতী কন্যাগণকে উদ্ধার করিয়া তাঁহাদের পাণিগ্রহণপূর্বক সকলের সর্ব সময়ে প্রীতিবর্দ্ধন করিয়া প্রত্যেকের গর্ভে দশজন করিয়া পুত্রোৎপাদন; ইহা কি কম বীর্য্যবত্তার পরিচয়?

৩। সমগ্র যশ — উপরিলিখিত কারণে ও তাঁহার বিশ্ববিমোহন রূপ, সৌন্দর্য্য, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, আদর্শ গার্হস্থ্য-জীবন, দেব দ্বিজে ভক্তিপরায়ণতা, সাধুসজ্জনের সেবা প্রভৃতি গুণের জন্য দিকে দিকে যশঃ বিস্তৃত হইয়াছিল।

৪। সমগ্র শ্রী— শ্রীর অর্থ লক্ষ্মী বা সৌন্দর্য্য; সমগ্র ধনসম্পদ প্রদায়িনী, সেই লক্ষ্মী তাঁহার কোলে সতত বিরাজমানা। ত্রিলোকের সমগ্র সৌন্দর্য্যের তিনি প্রতিভূ।

৫। সমগ্র জ্ঞান—সমস্ত বেদ, উপনিষৎ ও শাস্ত্রের সার যাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী গীতারূপে প্রকটিত, তদপেক্ষা জ্ঞানবান জগতে আর কে থাকিতে পারে?

৬। সমগ্র বৈরাগ্য - শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন নির্লিপ্ত সংসারী। সমস্ত সম্পদের অধিকারী হইয়াও কিছুতেই আসক্ত ছিলেন না। সংসারের মায়া তাঁহাকে বশীভূত করিয়া

রাখিতে পারে নাই। জন্মমাত্র সজ্ঞানে পিতা-মাতাকে ত্যাগ করিয়া গোকুলে গমন, যে যশোদামাতা বাল্যকালে তাঁহাকে লালন-পালন করিয়া বর্দ্ধিত করিলেন, যে গোপকুল ললনাগণ স্বামী, পুত্র আত্মীয়-স্বজন, জাতি, কুল, মান সব বিসর্জন দিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, মথুরাগমনকালে তাঁহাদের সহিত একটাবার সাক্ষাৎ করা বা মধুর বাক্যালাপে তাঁহাদের আপ্যায়িত করারও প্রয়োজন বোধ করিলেন না। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পৃথিবীর ভার হরণ করিয়া দেহত্যাগের পূর্বে নিজ অংশজাত যদুকুলের বিনাশসাধন পূর্বক স্বধামে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইহাও সমগ্র বৈরাগ্যের প্রমাণ দেয়। কৃষ ধাতুর সহিত অনট্ প্রত্যয় যুক্ত করিয়া 'কৃষ্ণ' শব্দ হইয়াছে। কৃষ ধাতুর অর্থ—কর্ষণ করা। আ—উপসর্গ যুক্ত হইলে আকর্ষণ হয়। যিনি সমস্ত জীবজগৎকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করেন, তিনিই কৃষ্ণ। সচরাচর দৃষ্ট হয়, লাঙ্গল দ্বারা ভূমি কর্ষণের ফলে ক্ষেত্রের সমস্ত ঘাস-আগাছা প্রভৃতির মূলোৎপাটন করিয়া উর্বরতা শক্তির বৃদ্ধিসাধন জন্য প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদিত হইয়া থাকে। সেইরূপ যিনি জীবহৃদয়ে বা ভক্তহৃদয়ে সদুপদেশ দ্বারা উদ্বোধিত করতঃ জ্ঞান বা অজ্ঞানজনিত সমস্ত কামনা-বাসনাকে আকর্ষণ করেন তিনিই কৃষ্ণ। গুরুরূপী ভগবানই উপদেশ ও মন্ত্র প্রদান দ্বারা শিষ্য ভক্তগণকে তাঁহার দিকে টানিয়া লন—জন্ম মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করেন। সেইজন্যই শাস্ত্রের প্রমাণ, গুরু এবং কৃষ্ণ এক, অভিন্ন। যেই গুরু সেই কৃষ্ণ, যেই কৃষ্ণ সেই গুরু। সৃষ্টিতে জীবমাত্রই মায়া আবরিত হইয়া সংসারচক্রের আবর্তে নিষ্পেষিত হইতেছে। যাঁহারা চক্রের কেন্দ্রে মূল খুঁটিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, অর্থাৎ গুরুকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া থাকেন তাঁহাদের আর সংসারচক্রে নিষ্পেষিত হইতে হয় না বা ঘূর্ণিপাকের আবর্তে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে পড়িতে হয় না। ভগবান-গুরু তাঁহাদেরকে পূর্ব হইতে সাবধান করিয়া দিয়া থাকেন। আর অন্যেরা আবর্তে পড়িয়া নানারূপ দুঃখ, কষ্ট, অশান্তি ভোগ করিতে থাকে। যদি কোন ব্যক্তি ঐ অশান্তির হাত হইতে রক্ষা পাইবার ইচ্ছা করেন বা নিরবচ্ছিন্ন শান্তি কামনা করেন, তখন ভগবান গুরু তাহার নিকট সদ্গুরুরূপে ধরা দিয়া অমৃত রাজ্যের পথ দেখাইয়া দেন। কুরুক্ষেত্রে সমবেত যুদ্ধাভিলাষী কুরু

ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন জ্ঞাতি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবগণের প্রতি মায়ামোহে আবিষ্ট হইয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার ভাব প্রকাশ করিলে তাঁহার রথের সারথী, দেহরথেরও সারথী শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে বন্ধু-হিসাবে নানা প্রকার উপদেশ দেন। এই উপদেশবাক্যগুলির মধ্যে কোনটি তাহার পক্ষে শ্রেয় বা উপযুক্ত হইবে তাহা নির্বাচন করিতে না পারিয়া, "যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" (গীঃ ২/৭) বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়া তাঁহাকে গুরু স্বীকার করিলে তখন গুরুরূপী কৃষ্ণ বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রের সার তত্ত্বোপদেশ সমূহ বিবৃত করিয়া জ্ঞানচক্ষু প্রদান করতঃ বিশ্বরূপ দর্শনদানে অর্জুনের মোহ বিনষ্ট করেন। প্রত্যেক জীবদেহই ধর্মক্ষেত্র। কুরুক্ষেত্র কর্মক্ষেত্রই। সংসারটা কর্মক্ষেত্র। এখানে কেহ কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। এই কর্মই বন্ধন বা মুক্তির কারণ হয়। নিজে কর্তা সাজিয়া কর্ম করিলে সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয় আর তৎপ্রীত্যর্থে, গুরু বা ভগবৎপ্রীত্যর্থে নিষ্কাম কর্ম করিলে তাহাতে মুক্তিলাভ হয়। জন্ম মৃত্যুর আবর্তে আর পড়িতে হয় না। এই দেহরূপ ধর্মক্ষেত্রে ধর্ম ও অধর্মের সংঘর্ষে কখন ধর্মের পরাজয়, কখন অধর্মের পরাজয় ঘটিয়া থাকে। কিন্তু শেষপর্যায়ে "যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ" অবশ্যম্ভাবী। সংসারধর্মক্ষেত্রে যাহা নিত্য ঘটিয়া থাকে, প্রত্যেক মানব-শরীরের মধ্যেও নিত্য ঘটিতেছে। 'ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্বাণি দেহতঃ।' 'যাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তাহা আছে দেহভাণ্ডে' । বহির্মুখী মনকে অন্তররাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা তাহা অবলোকন করিতে পারা যায়। এই দেহরাজ্য একাদশ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা পরিচালিত বা শাসিত হয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক, ও জিহ্বা; পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, যথা—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। মন তাহাদের রাজা। মনের দ্বারাই এই দশ ইন্দ্রিয় আজ্ঞাবহী ভৃত্যের মত তাহার অর্থাৎ মনের নির্দ্দেশানুসারে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। মন যখন সাধুসঙ্গ করে তখন তাহার প্রভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয় তন্মুখী হইয়া সদ্বস্তু দর্শন করে, সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ, সৎ-এর স্পর্শন, সেবন, গমন, আস্বাদন ইত্যাদি সৎকর্মে প্রবৃত্ত হয়। আবার মন যখন মায়াবিমোহিত হইয়া কামনা-বাসনায় অভিভূত হইয়া

পড়ে, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গ অসন্মার্গগামী পাপাচারীগণের সহিত মিলিত হইয়া এই সমস্ত আচরণে প্রবৃত্ত হয়। পরিণামে তাহাকে অনেক দুঃখ-কষ্ট, রোগ-শোক, বিরহ-বিচ্ছেদ, হাসি-কান্না, পাপ-তাপ প্রভৃতি যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হইতে হয়। মোহাচ্ছন্ন অচেতন হইয়া পড়ে, স্বরূপের বিস্মৃতি ঘটে। জীবের এই অবস্থা অবলোকন করিয়া দীনদয়াল, করুণাসিন্ধু, পতিতপাবন, ভগবানগুরুর দৈববাণী হয়, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত।" উঠ, জাগো, পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানী হও। এই দৈববাণী শ্রবণে মায়াবিমুগ্ধ জীবকুল আশ্বস্ত হয়। শয়নে, স্বপনে কিবা জাগরণে অহরহ চিন্তা করিতে থাকে যে কে আমাকে স্বরূপের সন্ধান দিতে পারিবে। এমন কে শক্তিধর পুরুষ আছেন যিনি আমাকে এই মায়ামোহরূপ শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া দিয়া আলোকবর্তিকাহস্তে ঘনঘটাপূর্ণ দুর্যোগ রজনীতে পথ দেখাইবেন? এই আকুল আকাঙ্ক্ষাই মনরূপী কংসের দৈব-বাণী শ্রবণে প্রাণঘাতী কৃষ্ণের অহরহ চিন্তা। প্রগাঢ় চিন্তার ফলে গুরুরূপী কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে। তিনি আবির্ভূত হইয়া কামনা-বাসনারূপ দৈত্য-কুল বিনাশ করিয়া নিম্নাভিমুখী মনকে মথিত করিয়া উর্দ্ধাভিমুখী স্বরূপের দিকে ফিরাইয়া দেন। ভোগের পথ রুদ্ধ করিয়া ত্যাগের পথে, শান্তির পথে পরিচালিত করেন। স্বয়ং ভগবানের হাতে যাহার মৃত্যু হয়, সে মুক্তি লাভ করে।

গুরুকৃষ্ণের জয় হউক!!!

"মৃত্যুটাকে আমরা এত বড় করিয়া দেখি বলিয়াই সে আমাদিগকে ভয় দেখাইতে পারে। এ যেন ছোট ছেলের মিথ্যা জুজুবুড়ীর ভয়। যে মরণকে একদিন সকলকেই বরণ করিয়া লইতে হইবে, সে আমাদের হিসাবের দু'দিন আগে আসিল বলিয়াই কি আমাদের এত বিক্ষোভ, এত চাঞ্চল্য? যে খবর না দিয়া আসিত, সে খবর দিয়া আসিল বলিয়াই কি আমরা তাহাকে পরম শত্রু মনে করিব? ভুল, ভুল —মৃত্যু মিত্ররূপেই আমার কাছে দেখা দিয়াছে।"

--- **বিপ্লবী দীনেশ গুপ্ত (১৯১১-১৯৩১)**

বিখ্যাত নাট্যকার, অভিনেতা শ্রী গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা দেখতে আমন্ত্রিত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে অভ্যর্থনা জানাতে এলেন। ঠাকুর গিরিশকে দেখে নমস্কার করলেন। গিরিশবাবুও নমস্কার করলেন, ঠাকুর আবার নমস্কার করলেন। ওইভাবে বেশ কয়েকবার চলল- নমস্কার আর প্রতি নমস্কার। শেষে গিরিশ ঘোষ নিরস্ত হলেন।

জগাই-মাধাই এসেছিলেন অবতার চৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে লীলা সহচর হয়ে, তেমনি গিরিশচন্দ্র এসেছিলেন ঠাকুরের এক লীলা-পার্ষদ রূপে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপাধন্য মদ্যপ গিরিশের ভক্ত গিরিশে রূপান্তরের ঘটনা আমরা কম-বেশি সবাই জানি। পরবর্তীকালে ভক্ত গিরিশ নিজের জ্ঞান, ভক্তি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলেছিলেন, 'রামচন্দ্র তীর ধনুক নিয়ে পৃথিবী জয় করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ জগত জয় করেছিলেন তাঁর বাঁশির সুরে। আর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিশ্বজয় করেছিলেন তাঁর প্রণাম অস্ত্রে।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করে গিরিশচন্দ্র বলেছেন, 'তুমিই পূর্ণব্রহ্ম। তা যদি না হয়, সব মিথ্যা।' ঠাকুরও তেমনি তাঁর লীলা সমাপ্তির কিছুদিন আগে বিবেকানন্দ সহ শিষ্যদের সবাইকে গেরুয়া বস্ত্র দান করেছিলেন, গিরিশকেও গেরুয়া বস্ত্র দিয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিগত জীবনে প্রণাম বা নমস্কারের ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখেছি একাধিকবার। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শন- 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়' মন্ত্রের অনুবর্তী ক্রমে প্রণাম মন্ত্রটি মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে দৈনন্দিন সংসার কর্মের প্রতিপদে ঈশ্বর প্রাপ্তির সোপান বা সহজতম উপায় প্রদর্শিত প্রাচীন শাস্ত্রেরই মর্মবানী। তাঁর প্রণাম বা নমস্কারের দর্শন কোনো নতুন দর্শন, তত্ত্ব নয় বরং সাধারণ অন্নগত-প্রাণ মানুষের মুক্তির অনুকরনীয় এক আদর্শ জীবন পদ্ধতি।

মনে প্রশ্ন জাগে কি এই প্রণাম বা নমস্কারের মাহাত্ম্য ?

প্রণাম বা নমস্কার দুটোই সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ এক। প্রণাম শব্দের উৎপত্তি হয়েছে ‘প্র’-নম-অ-ঘঞ থেকে ‘প্র’ পূর্বক ‘নম’ ধাতু থেকে প্রণাম শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ হ’ল প্রকৃষ্ট রূপে মস্তক অবনত করা। অর্থাৎ প্রণামের প্রয়োগ আরাধ্য দেব-দেবী, গুরু, শিক্ষক বা অধিক গুণসম্পন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি বিশেষকে বন্দনা করা। বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই ‘প্র’ উপসর্গের অর্থ গতি, শক্তি, উৎপত্তি, ইচ্ছা ইত্যাদি। তেমনি ‘নমস্কার’ শব্দের উৎপত্তি ‘নমস্’ ‘কৃ’ ধাতু -- ঘঞ থেকে। ‘নমস’ শব্দের অর্থ হল নত হওয়া, ‘কৃ’ ধাতুগত শব্দের অর্থ হল ‘করা’। দুটির মিলিত অর্থ নতি স্বীকার করা, বা, সম্মান করা এবং অধিকৃত সদ্গুণকে স্বীকার করা।

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রণাম বা নমস্কারের উদ্দেশ্য, মহত্ব, গুণাগুণ, আধ্যাত্মিক বা সাংস্কৃতিক তাৎপর্য অপরিসীম। প্রণাম সংক্রান্ত বিষয়ে শাস্ত্রীয় পদ্ধতি আছে। এই সমস্ত পদ্ধতিকে তিনটি ভাবে বিন্যস্ত করা হয়ে থাকে। যথা (১) কায়িক (২) বাচিক (৩) মানসিক। এর প্রত্যেকটি আবার ত্রিগুণের অধীন। যথা (১) সত্ত্ব (২) রজঃ (৩) তমঃ , মতান্তরে উত্তম, মধ্যম ও অধম শ্রেণিভুক্ত। (সূত্র: অথ প্রণাম পর্ব, পৃষ্ঠা ১৩)

শাস্ত্রে আছে— ‘একত্রাবস্থিতানাং চ নরানাং ধর্মকামিনাং। ভাবনা যাতি সূক্ষ্মানাং মহতাং প্রভবৎ মনঃ।’ - নিষ্কাম ভাব নিয়ে মন্দির প্রাঙ্গনে প্রবেশ করলে সেখানে আধ্যাত্মিক পরিবেশ দৃঢ়তর হয়। উল্লেখ্য, সেখানে শাস্ত্রোক্তভাবে প্রণাম করা বিধেয়। ত্রিবিধ গুণযুক্ত এবং ত্রিবিধ প্রণামের মধ্যে কায়িক প্রণামই শ্রেষ্ঠ। এটি আমাদের আত্মসমর্পনের পদ্ধতি শিখিয়ে দেয়। (সূত্র: অথ প্রণাম পর্ব, পৃষ্ঠা ১৩)
শ্রীমদ্ভাগবতের (১১।৭।৪৫) মতে আরও বহুবিধ প্রণাম-নমস্কার পর্ব আছে। যেমন- মানসিক প্রণাম, দৃষ্টিগত প্রণাম, আসনোপবিষ্ট প্রণাম ইত্যাদি।
‘দোর্ভ্যাং পড্যাং করাভ্যাম্ চ জানুভ্যাম উরসা ধিয়া। মনসা বচসা চেতি প্রণামোহষ্টাঙ্গ উচ্যতে।।’ (শ্রীমদ্ভাগবত স্কন্ধ ১১ অধ্যায় ৬)
—অর্থাৎ অষ্ট অঙ্গ দ্বারা যে প্রণাম নিবেদন করা হয়, তাতে দুই বাহু, দুই পা, দুই জানু, বক্ষ, মস্তক, দুই চক্ষু, মন এবং বাক্য - এগুলো ভূমিতে আলম্ব করতে হয়।

'আদোর্ভ্যাং পড্ভ্যাং করাভ্যাম্ নিষ্ফলং ভবেৎ।'

অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুকে বামদিকে, শিব ও শক্তিকে ডান দিকে, গুরুকে নিজের অগ্রে রেখে প্রণাম করতে হয়; নতুবা প্রণাম নিষ্ফল হয়।

এছাড়াও পদ্মপুরাণে, নৃসিংহ পুরাণে বলা হয়েছে ভগবানকে বামে রেখে প্রণাম করা উচিৎ।

প্রণামের যতই বিধি থাকুক না কেন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়— 'একটি নমস্কারে, প্রভু একটি নমস্কারে, সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার এ সংসারে।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'আমি কালী ঘরে যাই, আবার ঘরের এই সব নমস্কার করি; তাই সকলে করে। তারপর অভ্যাস হয়ে গেলে যদি না করে তাহলে মন হুসফুস করবে।'

রামকৃষ্ণ কথামৃতে পাই সন্ধ্যার পরই শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতাকে নমস্কার করিয়া হরিধ্বনি করিতেছেন। কক্ষমধ্যে ঠাকুরদের ছবি; ধ্রুব-প্রহ্লাদের ছবি, রাম রাজার ছবি, মা কালীর ছবি, রাধাকৃষ্ণের ছবি। তিনি সকল ঠাকুরকে উদ্দেশ করিয়া তাঁহাদের নাম করিয়া প্রণাম করিতেছেন। আবার বলিতেছেন, ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান; ভাগবত-ভক্ত-ভগবান; ব্রহ্ম শক্তি, শক্তি ব্রহ্ম, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, গীতা, গায়ত্রী, শরণাগত শরণাগত নাহং নাহং, তুঁহু-তুঁহু; আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী; ইত্যাদি (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ১০২, শ্রীম প্রণীত)

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একথাও বলেছেন, 'সব মতকে নমস্কার করবে, তবে একটি আছে নিষ্ঠা ভক্তি। সবাইকে প্রণাম করবে বটে, কিন্তু একটির উপর প্রাণ ঢালা ভালোবাসার নাম নিষ্ঠা (পৃষ্ঠা ৬৪ রামকৃষ্ণ কথামৃত তৃতীয় খণ্ড)। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন পাণ্ডবেরা যখন রাজসূয় যজ্ঞ করেন, তখন যত রাজা সব যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে বসিয়ে প্রণাম করতে লাগল। বিভীষণ বললেন, আমি এক নারায়ণকে প্রণাম করব; আর কারুকে করব না। তখন নারায়ণ নিজে যুধিষ্ঠিরকে ভূমিষ্ঠ হয়ে

প্রণাম করতে লাগলেন। তবে বিভীষণ রাজমুকুট সুদ্ধ সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করেন।' (পৃষ্ঠা ৪৫-৪৬ রামকৃষ্ণ কথামৃত দ্বিতীয় খণ্ড)

কথামৃতে ঠাকুর ভক্তদের বলেছেন নারদ যখন রামচন্দ্রকে দর্শন করতে গেলেন রাম উঠে দাঁড়িয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন আর বললেন, আমরা সংসারী জীব, আপনাদের মত সাধুরা না এলে কি করে পবিত্র হবো? (পৃষ্ঠা ১৮১-১৮২ কথামৃত দ্বিতীয় খণ্ড)।

অন্যত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'আমায় তিনি এ অবস্থায় রেখেছেন কেন? চৈতন্যদেব সন্ন্যাস করলেন সকলে প্রণাম করবে বলে, যারা একবার নমস্কার করবে তারা উদ্ধার হয়ে যাবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব গিরিশ সহ সব ভক্তদের বলেছিলেন সন্ধ্যা হলে সব কর্ম ছেড়ে হরি স্মরণ করবে। এ সম্বন্ধে শ্রীমৎ তারাক্ষ্যাপাও বলেছিলেন, স্মরণ-মনন-প্রণাম-প্রার্থনা-সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্য কর্ম এবং জপ-ধ্যান ধারণারূপ উপাসনার সঙ্গে স্তবাদি পাঠ অবশ্য করণীয়।' শ্রীমৎ রামপ্রসাদও বলেছেন, 'ওরে মন বলি, ভজ কালী, ইচ্ছা হয় যেই আচারে। মুখে গুরুদত্ত মহামন্ত্র দিবানিশি জপ করে।। শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় করো মাকে ধ্যান। ওরে নগর ফির, মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে।'

আমরা দেখেছি ঠাকুরের আগেও অনেক মনীষী, জ্ঞানীরা এভাবেই প্রণাম মন্ত্রের প্রচার করে গেছেন কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রথম দেখেছি প্রণাম বা নমস্কারের চিরাচরিত প্রথার অতিরিক্ত অন্য এক মহান প্রয়োগ। তাঁর প্রণাম মন্ত্র শুধুমাত্র দেবদেবীদের মধ্যেই সীমিত ছিল না, জীব মাত্রই তাঁর কাছে ছিল প্রণম্য।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'ঈশ্বরই মানুষ, জীবজন্তু - সব হয়েছেন, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' - ভাবে তিনি প্রতিষ্ঠিত। স্বয়ং ঈশ্বর বিরাজ করছেন মানুষে মানুষে, মানুষে ও অন্য জীবের মধ্যে তফাৎ কেবল বিকাশ প্রকাশের তারতম্য। এই পার্থক্যবোধ হচ্ছে অন্তঃকরণের শুদ্ধতার তারতম্য বশতঃ। তাই মানুষই সব জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।'

প্রতিটি মানুষের মধ্যে ঈশ্বর সুপ্তরূপে আছেন তা তিনি প্রত্যক্ষ করতেন, দেখতেন মা প্রত্যেকের হৃদয়ে জ্বলজ্বল করছেন। তাই ঠাকুর মানুষমাত্র চণ্ডাল হোক, ব্রাহ্মণ হোক, জ্ঞানী হোক, অজ্ঞানী হোক, আস্তিক হোক বা নাস্তিক হোক, পুরুষ হোক বা মহিলা হোক, ধনী হোক বা নির্ধন, সবাইকে তিনি নমস্কার করতেন।

জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করেছিলেন যে মানুষ মাত্রের হৃদয়ে যদি ঈশ্বর বিরাজমান তবে চোর-ডাকাত, দুষ্টু লোকেদের মধ্যেও কি ঈশ্বর বিরাজ করছেন? উত্তরে ঠাকুর বলেছিলেন, হ্যাঁ, আছেন। -তবে কারুর মধ্যে তাঁর প্রকাশ বেশি কারুর মধ্যে কম। কারুর ভিতর সত্ত্বগুণ, কারুর রজোগুণ বেশি, কারুর তমোগুণ। বিদ্যাসাগরের উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ বেশি তাই তো তিনি দয়ার সাগর। আরও একটা সুন্দর উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন, মানুষগুলো সব দেখতে একরকম। সব পুলিই দেখতে একরকম কিন্তু কারুর ভিতর ক্ষীরের পুর, কারুর ভিতর নারিকেলের ছই, কারুর ভিতর কলায়ের পুর। তিনি তো সকল ভূতেই আছেন, তবে তিনি মানুষের ভিতর বেশি প্রকাশ। মানুষ কী কম গা? মানুষ চিন্তা করতে পারে, অন্য জীবজন্তু পারে না। আবার তিনি এও বলেছেন মানুষ মানে- 'মান' আর 'হুঁস' তবে মানুষ। এই দুটিই থাকতে হবে। মান অর্থ মর্যাদা আর হুঁস কথার তাৎপর্য চেতনা।'

তাইতো ঠাকুরকে দেখেছি যেমন বৈষ্ণব গোস্বামীদের, সাধুসন্তদের, ব্রাহ্মণদের, জ্ঞানী-গুণি লোকদের দেখলেই মাথা অবনত করে প্রণাম করতেন। ঠাকুরের কথায়, 'গাড়ি করে যাচ্ছি— বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলাম দুই বেশ্যা। দেখলাম সাক্ষাৎ ভগবতী। দেখে প্রণাম করলাম।' (পৃষ্ঠা ১৬৮, কথামৃত তৃতীয় খণ্ড)।

ঠাকুর এও বলেছেন, 'অন্তরে তিনিই আছেন। তাই বেদে বলে 'তত্ত্বমসি' (সেই তুমি) আর বাহিরেও তিনি। মায়াতে দেখাচ্ছে নানা রূপ; কিন্তু বস্তুতঃ তিনিই রয়েছেন। ঠাকুরের এই প্রণাম মন্ত্রের কল্যাণে অনেক পাপী-তাপী, অজ্ঞানী-মুর্খ, আস্তিক-নাস্তিক, সাকার-নিরাকার, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী লোকেরাও ঠাকুরের চরণে

নিজেকে সমর্পন করে উদ্ধার হয়েছেন। কীর্তন শেষে ঠাকুর জগন্মাতাকে প্রণাম করছেন আর বলছেন ‘ভাগবত, ভক্ত, ভগবান- জ্ঞানীদের নমস্কার, যোগীদের নমস্কার, ভক্তদের নমস্কার। অমর আত্মার স্বরূপই মানুষ। এই মানবসত্তা অনাদি অসীম, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত।’

পরিশেষে সমস্ত ভক্তদের প্রণাম করলেন। ভক্তরাও একে একে ঠাকুরকে প্রণাম করে নিজ নিজ বাসস্থানে প্রস্থান করলেন। কিন্তু ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সহজে এই প্রণাম মন্ত্র মেনে নিতে পারেননি। ডা. সরকার রাণী রাসমনির পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে তাঁর যাতায়াত ছিল। তিনি ঠাকুরকে কয়েকবার দেখেছেন। শুনেছেন কালী মন্দিরের এক পাগল ব্রাহ্মণের কথা। যখন ঠাকুরের গলার রোগ দেখা দিল তখন অনেক ডাক্তার কবিরাজ দেখান হয়েছিল কিন্তু রোগ নিরাময় হয়নি। ভক্তরা ডাঃ সরকারকে দিয়ে ঠাকুরের চিকিৎসা করাবেন মনস্থ করলেন। তৎকালীন কলকাতায় সাধারণ মানুষের মাসিক খরচা যখন ছিল ছয় টাকা তখন ডাঃ সরকারের ভিজিট ছিল ৩২ টাকা। ভক্তরা ওই খরচা বহন করবেন। ইতিমধ্যে ঠাকুর শ্যামপুকুরের উদ্যানবাটির খোলা মেলা বাগান বাড়িতে অবস্থান করছেন।

ডা. সরকার ছিলেন এক প্রথিতযশা বিজ্ঞান সাধক। ১৮৭৩ সালের ২৯শে জুলাই স্বীয় উদ্যোগে ভারতের বিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের নাম ‘ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স’। তিনি মূর্তি পূজোর কট্টর বিরোধী ছিলেন। তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাকেই বরণ করলেন এবং ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে 'দি ক্যালকাটা জার্নাল অফ মেডিসিন' নামক পত্রিকা বের করেন। কলকাতার শীর্ষ স্থানীয় ডাক্তার ছিলেন। এহেন প্রসিদ্ধ ডাক্তার ঠাকুরকে দেখতে এলেন। দেখেই বললেন, আরে তুমি এখানে? বসে পড়লেন ঠাকুরের বিছানায়। ভক্তরা অসন্তুষ্ট হলেও মুখে কিছু বললেন না।

ডাক্তারের মতে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের পাগলা পুরোহিত ছাড়া আর কেউ নয়। উপস্থিত ভক্তদের ডেকে বললেন - এরাই বুঝি তোমাকে এই বাড়িতে নিয়ে এসেছে? এত টাকা ভাড়া দিচ্ছে?

ডাঃ সরকার প্রখর যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক। স্পষ্ট কথায় অভ্যস্ত। রূঢ়ভাষী এবং তর্কবাগীশ। ঠাকুরের পরীক্ষা করে বললেন এত কথা বলা যাবে না। আর ভাব টাব চলবে না। ঠাকুরের ভাব দেখে বলেছিলেন হিষ্টিরিয়া রোগ। প্রথমবার ওষুধ পত্র বিধান দিয়ে ফিরে গেলেন। কিন্তু যাওয়ার আগে অনেকক্ষণ ঠাকুরের সান্নিধ্যে থাকলেন।

দ্বিতীয়বার ডাঃ সরকার ঠাকুরকে দেখতে এলেন কিন্তু এবার আর ঠাকুরের বিছানায় বসলেন না। মাটিতে মাদুর পেতে বসলেন। এর পরও অনেকবার এসেছিলেন। কিন্তু মাটিতেই বসেছেন। ঠাকুরের গান শুনে ডাঃ সরকার মুগ্ধ হয়ে যেতেন। যখন ঠাকুর ভাব সমাধিতে যেতেন তিনি তখন খুব কাছ থেকে ঠাকুরকে না ছুঁয়ে পরীক্ষা করতেন আর অবাক হতেন। একদিন ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন 'আমাকে কেমন দেখছ?' ডাক্তার বলেছেন, 'কি জানো? তোমার সত্যানুরাগের জন্য তোমায় এত ভালো লাগে। তুমি যেটা সত্য বলিয়া বুঝ, তার একচুল এদিক ওদিক করে চলতে পার না। অন্যস্থানে দেখি তারা বলে এক আর করে এক। ওটাই আমি একদম সহ্য করতে পারি না।' ক্রমশঃ ডাক্তার এক অমোঘ আকর্ষণে আসতেন আর ৬/৭ ঘণ্টা এখানেই থাকতেন। চিকিৎসা বা ওষুধের কথাই ভুলে যেতেন। ভক্তরা মনে করিয়ে দিলে ওষুধ দিতেন। কোনো ভিজিট নিতেন না।

একবার ঠাকুরের গান শুনে ডাক্তার সরকার ভাব বিহ্বল হয়ে উঠলেন। দুই চোখে জলের ধারা। ঠাকুরকে বললেন— 'যখন তুমি গাচ্ছিলে— 'দে মা পাগল করে, আর কাজ নেই জ্ঞান বিচারে।' তখন আর থাকতে পারি নাই। দাঁড়াই আর কি! তারপর অনেক কষ্টে ভাব চাপলুম। ভাবলুম যে প্রদর্শন (Display) করা হবে না।'

ফেরার সময় গিরিশ ঘোষ সহ সব ভক্তরা ঠাকুরের পদধূলি মাথায় নিয়ে প্রণাম করলেন। এসব দেখে ডাঃ সরকার কিন্তু মেনে নিতে পারেননি। বলেছিলেন— ‘যে মানুষ হাগে, মোতে, তার পদানত হব কেন? ঈশ্বরকেই মাথা নোয়াব।’

মাস্টার (শ্রীম) বললেন ‘হিন্দু ধর্মে সর্বভূতে নারায়ণ, তিনি সর্বভূতেই থাকেন তবে তাঁকে প্রণাম করতে কি? পরমহংসদেব বলেন ঈশ্বরকেই নমস্কার করা হয়- মানুষকে নয়। God is God- not man is God. তাঁকে তো ‘রিজনীং' (সামান্য বিচার) করে জানা যায় না। -সমস্তই বিশ্বাসের উপর নির্ভর। এই সব কথা ঠাকুর বলেন।’

একদিন ঠাকুর সমাধি ভাঙার পর ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এই যে ভাব-টাব দেখলে তোমার সায়েন্স কি বলে? তোমার কি এ সব ঢং বলে বোধ হয়? যদি ঢং মনে কর তাহলে তোমার সায়েন্স ফায়েন্স সব ছাই পড়েছ।’ ডাক্তার এর উত্তরে বললেন— ‘মহাশয়, যদি ঢং মনে করি তাহলে কি এত আসি? এই দেখ সব কাজ ফেলে আসি। কত রোগীর বাড়ি যেতে পারি না। এখানে এসে ছয়-সাত ঘণ্টা থাকি।’ কল ছাড়াই ডাক্তার আসতেন। ঠাকুরের কথা বলতে কষ্ট হয়। ডাক্তার ঠাকুরকে বলতেন— ‘আর কারো সাথে কথা কওয়া হবে না, কেবল আমার সাথে কথা কইবে।’

ডাক্তারের অন্তরের কোমল হৃদয়, ভক্তমন, আধ্যাত্মিক সত্তাকে অহমিকা ঢেকে রেখেছিল। ঠাকুরের কৃপায় তা দূর হোল। সহসা ডাঃ সরকার যেন সন্ধান পেলেন অন্তর্যামীকে, হৃদয়ের শতদল মাঝে ঠাকুরকে, ঠাকুর যেন আশীর্বাদ করে বলছেন চৈতন্য হোক, চৈতন্য হোক।

শেষ বয়সে ডাঃ সরকার কয়েকটি গান লিখলেন। তাঁর মধ্যে একটি—

‘যা মনে করি আমার,
তা সকলি তোমার।
কি দিয়ে তবে পুজিব তোমায়।
আত্ম অর্পন করি,

লহ হে নাথ দয়া করি,
তোমার ধন তুমি লহ।
কাজ নেই আমার তায়।'

এই সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ আমরা যারা ঠাকুরকে শ্রদ্ধা ভক্তি করি কিন্তু নিয়মিত জপ ধ্যান করতে পারি না, তাদের উচিৎ অন্ততঃ দিনে তিনবার সকালে, দুপুরে এবং সন্ধ্যায় ঠাকুরকে প্রণাম করা। প্রণাম আন্তরিক হলে ঠাকুরের কৃপায় জপ-ধ্যান, কীর্তনে মনোনিবেশ করতে পারব। ঠাকুরের কৃপায় এই প্রণাম অস্ত্রে আমাদেরও চৈতন্য হবে।

১৯৩৬ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শতবার্ষিকী জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উক্ত সভায় ভাষণ দেওয়ার সাথে স্বরচিত কবিতা ঠাকুরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেছিলেন।

'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে;
দেশ-বিদেশের প্রণাম আনিল টানি
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।'

"জগতের যত বড় বড় জয়, বড় বড় অভিযান,
মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান !
কোন রণে কত খুন দিল নর লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নাই তার পাশে !"

- সাম্যবাদী- (কাজী নজরুল ইসলাম)।

রোম। পৃথিবীর অর্দ্ধেকটা জুড়ে একটা সময় যার অধিকার বিস্তৃত ছিল, সেই রোম। খ্রীষ্টপূর্ব ৭৫৩ থেকে ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত যার সেনারা আফ্রিকা, ইউরোপ, পশ্চিম এশিয়ার দেশে দেশে আক্রমণ চালিয়ে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল, সেই রোম! রোমক সৈন্য যখন অরণ্যে প্রবেশ করেছে তখন সেখানে গড়ে উঠেছে সমৃদ্ধ জনপদ। রোমকদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে গথ, ভিজিগথ, ফ্রাঙ্ক, ব্রিটন প্রভৃতি জাতিরা একে একে অন্ধকারের জগৎ থেকে বেরিয়ে এসেছে সভ্যতার আলোকে। এ হেন রোমের রাস্তায় একদা সিঁথিগ্রামের এই অখ্যাত লেখক - বিশ্বাস হতে চায় না। চিমটি কেটে বুঝতে হয় স্বপ্নে না কি জাগরণে আছি। আর শুধু তো রোম নয়, সেটা তো ইউরোপ ভ্রমণের শেষের কবিতা। লন্ডন থেকে শুরু করে প্যারিস, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, অস্ট্রিয়া ঘুরিয়ে 'স্মাইলস পার মাইলসের' ভ্রমণ সূচী যেভাবে ইতালির বিখ্যাত দুই শহর ভেনিস আর পিসা দেখিয়ে রোমুলাসের দেশে এনে ফেললো, তাতে আমরা তো কোন ছার, অনেক আচ্ছা ঘুরনে ওয়ালাদেরও মাথা ঘুরে যাবে। আমরা তো শুধুমাত্র মাঝে মাঝে গায়ে চিমটি কেটে দেখেছি।

রোম দেখাবার জন্য যে ইংলিশ স্পিকিং গাইডকে আমাদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল সেই 'মিকেলা' প্রথমেই যেখানে নিয়ে এল সেটাই রোমের বৃহত্তম 'বারোক' স্টাইলের ফোয়ারা– Trevi Fountain. ৮৬ ফুট উচ্চতা আর ১৬১.৩ ফুট চওড়ায় সমুদ্রের আদিদেবতাকে বিশাল জলরাশি সহ যেভাবে রূপমূর্তি দেওয়া হয়েছে তা দেখলে অবাক হতেই হয়। নিকোল সালভির ডিজাইনে এই স্থাপত্য অবশ্য পরিসমাপ্ত হয় ১৭৬২-তে, স্থপতি 'জিউসেপ্পে পান্নিনি'র (Giuseppe Pannini) হাতে। পিয়াজ্জা দ্য ট্রেভির এই বিস্ময় একটু দূর থেকে দেখাই মঙ্গল। খরচহীন দর্শনে ভিড়ের ঠেলা সামলেও দিব্য ফটো নেওয়া যায়। দুই ইউরো দিয়ে ইনার পেরিফেরিতে ঢুকলে যে কি অবস্থা হয় সেটা গ্রুপের সকলেই বোধ হয় হাড়ে

হাড়ে টের পেয়েছে। দূরকে হয়তো নিকট করেছি, কিন্তু কৌতূহলী জন-সমুদ্রে নাকানি-চুবানি খেতে খেতে দু'দণ্ড মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকার সময় হয়নি, দলের বাকি সকলকে খুঁজে পাওয়াই যেন প্রধান হয়ে উঠেছিল। তবে কাছে গেলে ফোয়ারার জলে কয়েন ফেলার সুযোগ মেলে। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী একটি মুদ্রা জলে ফেললে আবার রোম দর্শন, আর দুটি ফেললে প্রেমিকের মন জয় এবং তিনটি কয়েন জলে ফেললে বিবাহ, অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থেই জলে পড়বেন। এ' বয়সে নতুন করে কারোও মন জয়ের বাসনা নেই, আর বিয়ের ব্যাপারে তো – 'একটি নিয়েই গলদ ঘর্ম, ডিউ পার্টে তো 'নেই কো লোভ।' তাই পকেট খুঁজে একটি ভারতীয় মুদ্রা বার করে জলে ফেলি, ইউরোর যে অনেক দাম।

হিউম্যান ট্রাফিক জ্যামে আটকে গিয়ে যখন চোখে শুধুই রেড সিগন্যাল, উদ্ধার করলো সেই 'মিকেলা'ই। ট্যুর ম্যানেজারকে আর পাত্তা না দিয়ে গাইডকেই শুধু পাখির চোখ করে যেখানে এসে পৌঁছালাম, সেখানে যে কারও চোখ টেড়িয়ে যেতে বাধ্য। সোজা কথা তো নয়, পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম কলোসিয়াম (Colosseum)! বিশেষত সে দিনটা আবার ২রা জুন হওয়ায় পুরো জায়গাটাই যেন স্বাধীনতার সাজে সেজেছিল। ১৯৪৫ সালের এই দিনটাতেই ইতালি স্বৈরাচারী একনায়কতান্ত্রিক শাসন থেকে মুক্তি পেয়ে হয়ে উঠেছিল প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। স্বাধীনতা দিবস বলেই কলোসিয়ামে প্রবেশাধিকার মিললো না বটে, কিন্তু সৈন্যদের কুচকাওয়াজ, যুদ্ধবিমানের মহড়ার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া রঙের ফোয়ারা দেখে পাওয়া না পাওয়ার হিসেবটা যেন গুলিয়ে গেল। অন্ততঃ কি পাইনি ভাবনাটাকে কলোসিয়ামের দেওয়ালের ওপাশে রেখে আসতে পেরেছিলাম। ফ্ল্যাভিয়ান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট ভেসপাসিয়ানের (Vespasian) আমলে (৭২ খ্রিঃ), শুরু আর সম্রাট টাইটাসের (Titus) কালে (৮০ খ্রিঃ) শেষ হওয়া ৫০,০০০ দর্শকের এই জায়ান্ট স্টেডিয়ামের সামনে দাঁড়ালে প্রথমেই যা মনে হয়, তা হলো গ্লাডিয়েটরদের কথা। মানুষে মানুষে মরণপণ যুদ্ধ—যতক্ষণ না একজনের মৃত্যু হয়। যে বেঁচে থাকে তাকে আবার অবতীর্ণ হতে হয় পরবর্তী বেঁচে থাকার লড়াইয়ে। শুধু কি তাই? যুদ্ধ

হতো মানুষের সাথে আফ্রিকা অথবা এশিয়া থেকে আনা সিংহ, লেপার্ড অথবা বিশালাকার হাতীর সাথে। ১৮০ মিটার লম্বা আর ৫০ মিটার উচ্চতার কলোসিয়ামের ভিতরটা দেখতে না পেলেও ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজে স্থান পাওয়া কলোসিয়াম কে বাইরে থেকে যা দেখেছি তাই বা কম কি?

কলোসিয়ামের কাছেই রোমান সম্রাট নিরোর প্রাসাদ Domus Aurea বা গোল্ডেন হাউস। ৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রোম নগরীর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর নির্মিত এই প্রাসাদটিকে জনরোষ এড়াতে নিরোর মৃত্যুর পর ধ্বংস করে ফেলা হলেও, মাটির নিচে থেকে উদ্ধার হওয়া ভাঙা প্রাসাদের সামনে দাঁড়ালে এখনও যেন শোনা যায় নিরোর বীণা। জ্বলন্ত রোমের মাঝখানে আজকেও যেন তিনি গান বাজিয়ে চলেছেন। কখনও চলা কখনও হঠাৎ থমকে যাওয়া, এভাবেই এক সময় কলোসিয়ামের ৫.৩ কিলোমিটার দূরে রোমের বিখ্যাত 'ক্লক টাওয়ার' দেখা হয়ে যায়। ১৬৪৭ থেকে ১৬৪৯ সালে ফ্রান্সিসকো বোরোমিনির (Francesco Borromini) সৃষ্ট এই ক্লক টাওয়ারের Torre dell' Orologio-র সামনে খানিকক্ষণ থেমে না থাকার উপায় ছিল না।

রোমে যে চারটি প্রধান ক্যাথলিক চার্চ বা 'Papal Basilica' রয়েছে, তার মধ্যে সর্বপ্রধান অবশ্যই ভ্যাটিকান সিটির 'সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকা'। সেটাও আমরা দেখেছি, তবে তা অন্যদিন—টাইবার নদী পার হয়ে ভ্যাটিকানে।

তার আগে বলি অন্য তিন প্রধানের অন্যতম রোমের সবচেয়ে পুরোনো পাবলিক চার্চ তথা অফিসিয়াল ক্যাথিড্রাল অফ রোমের কথা। চতুর্থ শতাব্দীতে সম্রাট কনস্টান্টাইনের আমলে শুরু হয়ে পোপ সিলভেস্টারের হাতে শেষ হওয়া সেই 'সেন্ট জন ল্যাটেরান' (St. John Lateran Basilica) দেখতে আমাদের হাঁটতে হয়েছিল কলোসিয়াম থেকে অন্তত ২.৮ কিলোমিটার। শুধু তো ব্যাসিলিকা নয়, ল্যাটেরান প্যালেস, ল্যাটেরান ব্যাপ্টিস্টারি আর হোলি স্টেয়ারস (Scala Santa) নিয়ে ল্যাটেরান সত্যিই রোমের বিখ্যাত এক ঐতিহাসিক ক্ষেত্র।

নিজেদের মতো করে রোম দেখতে পারলে যেভাবে সে ঘোমটা খুলতো, ট্যুর কোম্পানীর সাথে ঘুরলে অবশ্যই তেমনটা নয়। এখানে তো গভীরভাবে দেখার কোন প্রশ্নই নেই, যেটা আছে সহজ ভাষায় তাকে বলে দৌড়নো। সেই রকম দৌড়েই লাস্ট ল্যাপে পেয়ে গেলাম ভিক্টর এমানুয়েলের স্মৃতিস্তম্ভ। সেই এমানুয়েল II (Victor Emmanuel-II), যিনি ছিলেন ইউনিফায়েড ইতালির প্রথম সম্রাট। তবে বলতেই হবে ১৯১১-য় তৈরী সাদা মার্বেলের এই ২৬৬ ফুট ম্যাসিভ জাতীয় মনুমেন্ট না দেখলে রোম দর্শন আমাদের অসম্পূর্ণ থেকে যেতো।

মিকেলার সাথে রোমের পথ চলা যেন শেষ হয়েও শেষ হতে চায় না। কারণ রোমের মধ্যেই যে মুক্তোর মত বিরাজমান বিশ্বের ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র ভ্যাটিকান সিটি। মাত্র ০.৪৪ থেকে ০.৪৯ বর্গ কিলোমিটারের একটা ছোট্ট দেশ, যার স্থায়ী জনসংখ্যা ৫০০-৬০০ এর বেশি হবে না, সেখানেই রয়েছে ১৫,১৬০ বর্গমিটার ইন্টেরিয়র ফ্লোর এরিয়া নিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম চার্চ 'সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকা'। পরবর্তী কালে (১৯৮৬-১৯৮৯) আইভরি কোস্টের 'Our Lady At Peace' যদিও সামগ্রিক আয়তনের বিচারে সেন্ট পিটার্স কে টেক্কা দিয়ে গিনেস বুকে নাম তুলে ফেলেছে, কিন্তু তাতে সেন্ট পিটারের সমাধির ওপর তৈরী মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর স্মৃতি বিজড়িত এই চার্চের মাহাত্ম্য এতটুকু কমেনি। ইতিহাস বলছে ৬০,০০০ খ্রিষ্টানের উপাসনা স্থল এই চার্চ তৈরী হয়েছে ১৫০৬ থেকে ১৬২৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে, তবে আসল সত্যটা হলো মূল চার্চটি আরও অনেক পুরানো - চতুর্থ শতকের। পুরোনোকে ভেঙে নতুন রূপ দিতে চার্চের ডোমের ডিজাইন করেছিলেন মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, আর অলঙ্কৃত যত স্তম্ভের ভাবনা ভেবেছিলেন ১৬-১৭ শতকের স্থপতি বের্নিনি (Bernini)। মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর আরও অনেক কীর্তি এই ব্যাসিলিকাতেই আছে। তবে যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা স্তব্ধ ভাষা, রুদ্ধশ্বাস হয়ে গেছিলাম তা হল 'Mary Holding Jesus' - মাথা এখানে আপনা থেকেই নত হয়ে যায়, তা আপনি যে ধর্মেই বিশ্বাসী হোন না কেন। ব্যাসিলিকা পর্ব শেষ হলে মিকেলা আমাদের হাত ছাড়লো। তারপর ভ্যাটিকান মিউজিয়ামে প্রবেশের আগে আমাদের গ্রুপটাকে দু'ভাগ করে দুই গাইডের

সাথে জুড়ে দিলে আমরা যার সঙ্গ নিলাম তিনি একজন মিউজিয়াম এক্সপার্ট – মিস অ্যালেনা। আগেই জানতাম রবিবার বাদ দিয়ে বাকি সবদিন মিউজিয়াম সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত খোলা থাকে। যেটা জানতাম না এন্ট্রিতে শুধু টিকিট নয়, পাসপোর্টও হাতে রাখতে হয়। এই দুই ডকুমেন্টের মধ্যে যে এমন চিচিং ফাঁক মন্ত্র লুকিয়ে আছে তা ষোড়শ শতাব্দীর পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসের হাতে তৈরী এই ৫৪ গ্যালারী সমৃদ্ধ মিউজিয়ামে প্রবেশের আগে ভাবতেই পারিনি। ঢুকে পড়ার পর মনে হলো ক্লাসিকাল থেকে শুরু করে রেনেসাঁ ও তার কাছাকাছি সব শিল্পীদের অসাধারণ পেইন্টিং সহ বিশ সহস্রাধিক দর্শনীয় সম্ভারের সংগ্রহ এই সংক্ষিপ্ত সময়ের ঘোড়দৌড়ে দেখবো কি ভাবে? তা'বলে আমরা কিন্তু রাফায়েল গ্যালারির (Raphael's Room) অনেক রেনেসাঁ ফ্রেস্কোর সঙ্গে 'The School Of Athens' দেখতে ছাড়িনি। অবশ্যই দেখেছি প্রথম শতাব্দীর স্থপতি Agesander, Athenedoros এবং Polydorus নির্মিত লাইফ সাইজের স্ট্যাচু 'Laocoon And His Sons'। সেই যাজক লাওকুন - যিনি গ্রিকদের প্রেরিত কাঠের ঘোড়া দেখে বুঝেছিলেন এটি ট্রয়বাসীর জন্য একটি ফাঁদ। এছাড়াও রয়েছে প্রাচীন মুদ্রা, হোলি ক্রপ, পাথরের রাজসিক বাথটব, অজস্র স্ট্যাচু আর অসাধারণ কারুকার্যের সিলিং - দেখার সময় ঘন্টাগুলো কখনও যে মিনিটের বেগে দৌড়ে পালায় বোঝাই যায় না। ঘরের মধ্যে ঘরের মত ভ্যাটিকান মিউজিয়ামের মধ্যেও যে মিশরীয় শিল্পের (Egyptian Artifacts) নয় ঘরের এত বড় প্রদর্শন শালা রয়েছে, তা না দেখলে বিশ্বাস হতে চায় না। এক থেকে নয় নম্বর গ্যালারি দেখতে দেখতে ভুলে যেতে হয় কোথায় এসেছি - রোম নাকি ইজিপ্টে।

ভ্যাটিকান মিউজিয়ামের শেষ অংশে রয়েছে অ্যাপোস্টলিক প্যালেসের সিসটাইন চ্যাপেল (Sistine Chapel)। ১৪৭৩ থেকে ১৪৮১ তে পোপ চতুর্থ সিক্সটাসের (Sixtus IV) নির্দেশে নির্মিত এই চ্যাপেল শুধু এক খ্রীষ্টীয় উপাসনালয় নয়, পোপের সরকারী বাসস্থান ও বটে। নতুন পোপের নির্বাচন স্থল (Papal Conclave) হিসেবেও ব্যবহৃত হয় ভ্যাটিকানের এই বিখ্যাত চ্যাপেল। শুধু কি তাই?

স্থপতি জিওভানি দেই দোলচির নকশায় তৈরী এই ছাদের অলঙ্করণে রয়েছে মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর ছোঁয়া – যার মধ্যে 'দ্য ক্রিয়েশন অফ অ্যাডাম' সহ 'বুক অফ জেনেসিস' র নয়টি ছবি তো জগৎ বিখ্যাত। দেওয়ালে তাঁর 'লাস্ট জাজমেন্ট' এর কথাই বা কে না জানে! দেওয়ালে দেওয়ালে বত্তিচেল্লি, পেরুজিনো এবং ডোমেনিকো ঘিরলান্দাই- এর মত রেনেসাঁর যত দিকপাল শিল্পীদের হাতের কাজ! হয়তো বড্ড তাড়াহুড়ো করেই দেখে নিতে হলো, তবু রোম দর্শনে আমার জীবন সার্থক!

রোমের রাস্তা

কলোসিয়াম

ট্রেভি ফাউন্টেন

ভ্যাটিকান মিউজিয়ামে

লাওকুন অ্যান্ড হিজ্ সন্স

আর্টেমিস অফ এফেসাস

ক্লক টাওয়ার

সিলিংয়ের কাজ

শরৎ

শ্রী স্বপন মহান্তী

শরৎ মানে শিশির ফোঁটা
সাদা মেঘের রেখা,
শরৎ মানে শিউলি সুবাস
সবুজে মাঠ ঢাকা।
শরৎ মানে হাওয়ার দোলায়
মাতাল কাশের বন।
শরৎ মানে ঢেং কুড়কুড়
দুগ্‌গা আগমন।

শরৎ মানে নতুন সুরে
মনে হাসির ঢল।
শরৎ মানে ভরা নদী
আনন্দে কলকল।

শরৎ মানে চাষীর ঘরে
অভাব অনটন।
শরৎ মানে সোনালী রোদ
ভ্রমর গুঞ্জন।

শরৎ মানে চাঁদিনী রাত
করম, ঝুমুর গান।
শরৎ মানে প্রেমের ঢেউ
মিলন ঐকতান।

জন্মাষ্টমী

শ্রী শান্তশীল দাশ

এস কংসারি শ্রীমধুসূদন
ভক্তের ভগবান,
দৈত্য-দানব-লাঞ্ছিত ধরা
বেদনায় হতমান।

দুষ্কৃত জন ঘোরে চারিধার,
ধরণীর বুকে কী ঘন আঁধার;
নীরবে কত না ফেলে আঁখিজল
আর্ত ব্যথিত প্রাণ।

বাজাও তোমার পাঞ্চজন্য,
বাঁশি নয়, ধর অসি;
ভক্ত জনের হৃদয় উঠুক
আনন্দে উচ্ছ্বসি'।

নির্মম করে নাশ রিপুচয়,
পীড়িত-আর্তে দাও বরাভয়;
মলিনমুক্ত হোক ধরাতল,
জাগুক জীবন-গান।

কমলা রোদ্দুরে

সুনন্দন ঘোষ

কত পাহাড় নদী জনপদ ছুঁয়েছি
সাতটা দশক ধরে,
মন সজীব, তবু শরীর জুড়ে বিবশতা।
দিন ঢলছে। এখনও বাকি হাজার বছরের পথ চলা।

পৃথিবী চলছে কোটি বছরের পুরোনো ছন্দে।
রোদ মেঘের খেলায় যখন রং বদলায় আকাশের।
মাটিতে তখন জীবন মৃত্যুর পাঞ্জা খেলা।
আট হাজার মিটারের চোদ্দটা শিখরকে ছোঁয়ার পরেও
নির্মল হৃদয়ের অভিযাত্রী হারিয়ে যায় হিমানি সম্প্রপাতে।
সীমানার ওপারে নিজেদেরই ধর্মস্থানে রক্ত পান করে জিহাদীরা।
কর্মহীন অবসরে গজদন্ত মিনারে কূটতর্কে মেতে ওঠে
শূন্যমার্গের তাত্ত্বিক - দুর্গাপুজো, নাকি শারদোৎসব!

গাঢ় হয়ে আসে জলের নীল আভা।
বাতাসে ভেজা মাটির গন্ধ।
পাখিরা ফিরছে আপন নীড়ে।
ব্যালকনির সখের বাগানে
কমলা রোদ্দুরে বাদামী ডালে সবুজ পাতার আভাস।
হাজার বছরের পথে এখনও কি
অপেক্ষা করে আছে কোন এক বনলতা সেন?